# সবুজ গুঁড়ো

এইচ জি ওয়েলস

# সবুজ গুঁড়ো

( The Plattner Story)

['The Plattner Story' প্রথম প্রকাশিত হয় 'The New Review' পত্রিকায় এপ্রিল ১৮৯৬ সালে। ১৮৯৭ সালে লন্ডনের 'Methuen & Co.' থেকে প্রকাশিত ওয়েলসের ছোটগল্পের সংকলন 'The Platmer Story and Others' বইটিতে গল্পটি স্থান পায়। ১৯১১ সালে প্রকাশিত 'The Country of the Blind and Other Stories' সংকলনটিতেও গল্পটি স্থান পায়।]

গটফ্রায়েড প্ল্যাটনারের গল্পকে পাত্তা দেওয়া, না-দেওয়া পুরোটাই নির্ভর করছে সাক্ষ্যপ্রমাণ কতখানি বিশ্বাসযোগ্যতার ওপর। এদিকে রয়েছে সাতজন সাক্ষী। সঠিকভাবে বলতে গেলে সাড়ে ছজোড়া চোখ আর একটা এমনই ঘটনা, যা না মেনে উপায় নেই। অপরদিকে রয়েছে কুসংস্কার, উপস্থিতবুদ্ধি আর মতামতের জড়তা। যে সাতজন সাক্ষীর কথা বললাম, এদের চাইতে সরূপী সাক্ষী আদৌ আর হয় বলে মনে হয় না; প্ল্যাটনারের শারীরস্থান উলটে যাওয়ার মতো না-মেনে-উপায়-নেই ঘটনাও আর ঘটেছে বলে জানা নেই; এবং সাতজনেই যে কাহিনিটা শুনিয়েছে, তার মতো অসম্ভব গল্পও আজ পর্যন্ত কেউ শোনেনি! এই সাতজনের মধ্যে প্ল্যাটনারকেও আমি ধরেছি এবং কাহিনির মধ্যে সব চাইতে অসম্ভব অংশটা তারই অবদান। একদিকে জবরদস্ত সাক্ষ্যপ্রমাণ, আর-একদিকে নিরেট কুসংস্কার। অবস্থা আমার শোচনীয় হবে বুঝতেই পারছি। কোথাও একটা বক্রতা আছে এ ব্যাপারে কিন্তু তা কী ধরনের, তা জানি না। অবাক হয়েছি গণ্যমান্য মহলে এমন একটা উদ্ভট কাহিনি দারুণ পাত্তা পাওয়ায়–একেবারেই আশা করা

যায় না। এইসব বিবেচনা করেই গল্পটাকে বরং সরাসরি শুনিয়ে দেওয়াই ভালো–বেশি মতামত আর জাহির করতে চাই না।

গটফ্রায়েড প্ল্যাটনারের নামটা খটমট হতে পারে, কিন্তু জন্মসূত্রে সে খাঁটি ইংরেজ। তার বাবা ছিল অ্যালসেশিয়ান, ইংল্যান্ডে এসেছিল ছয়ের দশকে, বিয়ে করেছিল খানদানি ইংরেজ মেয়েকে, সারাজীবন কোনওরকম অভাবনীয় ঘটনা না ঘটিয়ে এবং প্যাটার্ন অনুযায়ী সাজানো কাষ্ঠখণ্ড দিয়ে মেঝে আচ্ছাদন করে মারা যায় ১৮৮৭-তে। গটফ্রায়েডের বয়স সাতাশ, জন্মসূত্রে তিন-তিনটে ভাষায় দখল থাকার ফলে সে দক্ষিণ ইংল্যান্ডের একটা ছোট্ট বেসরকারি বিদ্যালয়ের আধুনিক ভাষাসমূহের শিক্ষক। শিক্ষাগত ব্যাপারে অন্যান্য যে কোনও বেসরকারি বিদ্যালয়ের আধুনিক ভাষাসমূহের শিক্ষকের থেকে তার কোনও পার্থক্য নেই। তার জামাকাপড়ও খুব দামি বা শৌখিন নয়–যাচ্ছেতাই সস্তা বা নোংরাও নয়, গায়ের রং, উচ্চতা, চলাফেরা চোখে পড়ার মতো নয়। লক্ষ করলেই দেখবেন, বেশির ভাগ লোকের মতোই তার মুখের দুপাশ হুবহু এক নয়–একই অনুপাতে গড়া নয়, ডান চোখটা বাঁ চোখের চাইতে সামান্য বড়, ডানদিকের চোয়ালটাও একটু বেশি ভারী। আর পাঁচজনের মতো খুঁটিয়ে দেখার অভ্যেস আপনার না থাকলে তার খোলা বুকে কান পেতে ধুকপুকুনি শুনেও আপনার মনে হবে সে দশজনেরই একজন– কোনও তফাতই নেই। কিন্তু দক্ষ পর্যবেক্ষকের সঙ্গে আপনার পার্থক্য কিন্তু এইখানেই। ওর হৃৎপিণ্ড অতি মামুলি মনে হতে পারে আপনার কাছে, দক্ষ পর্যবেক্ষকের কাছে নয়। ধরিয়ে দেওয়ার পর খটকা লাগবে আপনারও। কারণ, গটফ্রায়েডের হৃদযন্ত্র ধুকুর পুকুর করে চলেছে বুকের বাঁদিকে নয়–ডানদিকে।

এইটাই কিন্তু একমাত্র সৃষ্টিছাড়া ব্যাপার নয় গটফ্রায়েডের দৈহিক কাঠামোয়। পাকা শল্যচিকিৎসকের পরীক্ষায় ধরা পড়ে আরও অনেক অদ্ভুত ব্যাপার। শরীরের অন্যান্য যেসব দেহাংশ সুসমঞ্জস, সুষম নয়–তার প্রতিটি একইভাবে বসানো রয়েছে উলটোদিকে। যকৃতের ডান অংশ এসেছে বাঁদিকে, বাঁ অংশ ডানদিকে; ফুসফুসও উলটো-পালটা। গটফ্রায়েড কস্মিনকালেও কুশলী অভিনেতা নয়। তা সত্ত্বেও সম্প্রতি তার ডান হাত আর বাঁ হাতের ব্যবহারও যেন উলটো-পালটা হয়ে গেছে। সবচেয়ে পিলে চমকানো ব্যাপার কিন্তু এইটাই। অদ্ভুত সেই কাণ্ডকারখানার পর থেকেই সে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে বাঁ হাতে লিখতে গিয়ে। ডান হাত ছুঁড়তে পারে না আগের মতো, খেতে বসে বড় বেকায়দায় পড়ে ছুরি-কাঁটা-চামচ নিয়ে। মহাবিপদে পড়ে রাস্তায় সাইকেল চালাতে গিয়ে। ডানদিক-বাঁদিক গুলিয়ে ফেলে। বিচিত্র এই ব্যাপারের আগে গটফ্রায়েড কিন্তু ল্যাটা ছিল না–সাক্ষ্যপ্রমাণের অভাব নেই। আগেই বলেছি, ছলচাতুরী তার কোষ্ঠীতে লেখা নেই–থাকলে এই অসংগত কাণ্ডকারখানার ব্যাখ্যা পাওয়া যেত।

চক্ষু-স্থির-করা এবং চমকপ্রদ আর-একটা ব্যাপারও শুনে রাখুন। নিজের তিনখানা ফোটোগ্রাফ হাজির করেছিল গটফ্রায়েড। পাঁচ-ছবছর বয়সের ছবিতে দেখা যাচ্ছে, মোটাসোটা পা ছুড়ছে ক্যামেরাম্যানের দিকে। এ ছবিতে দেখবেন, বাঁ চোখটা ডান চোখের চাইতে একটু বড়। বাঁদিকের চোয়ালও একটু ভারী। এখন কিন্তু ওর চোখ আর চোয়ালের ছবি ঠিক তার বিপরীত। চোদ্দো বছরের ছবিতে অবশ্য এই বিপরীত অবস্থাই দেখা যাবে। তার কারণ, ওই সময় জেম পদ্ধতিতে সরাসরি ধাতুর প্লেটে ছবি তোলার রেওয়াজ ছিল –আয়নায় যেমন উলটো হয়ে ছবি পড়ে, ফোঁটাগ্রাফিক প্লেটেও তেমনি পড়ত। একুশ বছর বয়সে তোলা তৃতীয় ফোটোগ্রাফে কিন্তু দেখবেন, শৈশবে ওর ডানদিক-বাঁদিক যেরকম ছিল, তখনও তা-ই আছে। এই থেকেই প্রমাণিত হয় যে,

গটফ্রায়েডের ডানদিক আর বাঁদিকের মধ্যে অদলবদল ঘটেছে হালে। নরদেহের এই ধরনের অত্যাশ্চর্য অদলবদল প্রকৃতই ফ্যান্টাস্টিক এবং অর্থহীন অলৌকিক ব্যাপার ছাড়া আর কিছু হতে পারে কি?

গটফ্রায়েড নিজেও তো ধাঁধায় পড়েছে। অসম্ভব এই দেহাংশ বদলাবদলি নিয়ে কারও সঙ্গে কথা বলতে গেলে মুখ লাল করে ফেলে। কাউকে বিশ্বাস করানোর জন্যে কোনও মাথাব্যথাই নেই–মুখ খুলতেই চায় না। চরিত্র আগে যা ছিল, এখনও তা-ই আছে। অর্থাৎ, ওর অন্তর-প্রকৃতি পালটায়নি–পালটেছে কেবল বাইরেটা এবং তার জন্যে বেচারি নিজেও ভারী লজ্জিত। চিরকালই সে মুখচোরা, স্বল্পভাষী, ধীরস্থির, বাস্তব-বুদ্ধিসম্পন্ন, বিয়ার পছন্দ, ধূমপানে অরুচি নেই, নিত্য ভ্রমণ-ব্যায়ামে অভ্যস্ত, শিক্ষাদানের ব্যাপারে উঁচুমান বজায় রাখতে সজাগ। কণ্ঠস্বর মার্জিত, গান গাইতেও পারে। বই পড়ার নেশা আছে, ঘুমায় মড়ার মতো, স্বপ্ন দেখে কদাচিৎ। ফ্যান্টাস্টিক এই উপকথা রচনা করার মতো মানুষই নয়। ফোটোগ্রাফ নকল করা যায়, ল্যাটা হওয়ার অভিনয় করা যায় কিন্তু চরিত্রগত এই বৈশিষ্ট্যগুলো তো থেকে যাচ্ছে।

শবব্যবচ্ছেদ মারফত দেহাংশের বদলাবদলি সপ্রমাণের প্রস্তাব গটফ্রায়েডের মনঃপূত নয় মোটেই। সুতরাং তার মুখের গল্পকেই মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই। স্থান-এর মধ্যে দিয়ে কোনও মানুষকে নিয়ে যাওয়ার কোনও উপায় আমাদের জানা নেই–যদি তা সম্ভব হত, তাহলেই তার ডানদিক-বাঁদিক পালটা-পালটি হতে পারত। যা-ই করুন-না কেন, ওর ডানদিক এখনও ডানদিকেই রয়েছে, বাঁদিক রয়েছে বাঁদিকে। খুব পাতলা, চ্যাপটা জিনিস নিয়ে আপনি এই বদলাবদলি ব্যাপারটা করতে পারেন। কাগজ কেটে একটা মূর্তি বানিয়ে উলটে নিলেই হল। কিন্তু নিরেট মূর্তি নিয়ে তা হয় না। গণিতবিদদের তত্ত্ব

অনুযায়ী নিরেট দেহের ডানদিক-বাঁদিক অদলবদল করে দেওয়া যায় দেহটাকে সটান স্থান থেকে বাইরে নিয়ে গিয়ে–অস্তিত্বের বাইরে নিয়ে গিয়ে। স্থান-এর বাইরে নিয়ে যেতে হবে। বিষয়টা দুর্বোধ্য। কিন্তু গণিত জানা থাকলে নিগুঢ় নয়। তাত্ত্বিক ভাষায়, ফোর্থ ডাইমেনশন অর্থাৎ ত্রিমাত্রিক জগৎ ছাড়িয়ে চারমাত্রিক জগতে পরিভ্রমণ করে এসেছে গটফ্রায়েড–ডানদিক আর বাঁদিক অদলবদলটাই তার প্রমাণ। গালগল্প শুনছি না যদি মেনে নেওয়া যায়–তাহলে ঠিক তা-ই হয়েছে। অকাট্য ঘটনাবলির ফিরিস্তি এখানেই শেষ করা যাক। এবার আসা যাক চমকপ্রদ সেই ঘটনার বর্ণনায়, যার পর থেকে প্ল্যাটনার অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল এই জগতের বাইরে। সাসেক্সভিল প্রোপ্রাইটারি স্কুলে প্ল্যাটনার ভাষা ছাড়াও পড়াত কেমিস্ট্রি, ভূগোল, হিসেব রাখার বিদ্যে, শর্টহ্যান্ড, ড্রয়িং এবং আরও অনেক বিষয়–ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবকদের চাহিদা অনুযায়ী। সব বিষয়ে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য না থাকলেও কিছু অসুবিধে হত না। মাধ্যমিক শ্রেণিতে শিক্ষকদের শিক্ষার মান নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। সবচেয়ে জ্ঞান কম ছিল কেমিস্ট্রিতে–তিনটে গ্যাসের অস্তিত্ব ছাড়া আর কোনও খবর রাখত না– গ্যাস তিনটের নাম কী কী, তা-ও সঠিক জানত না। ছাত্রছাত্রীরা জানত আরও কম। ফলে, মাঝে মাঝে বড় বেকায়দায় পড়ত প্ল্যাটনার। হুইল নামে একটি ছেলের জ্ঞানের স্পৃহা ছিল একটু বেশি–নিশ্চয় কোনও আত্মীয়ের নষ্টামি–শিখিয়ে দিয়েছিল মাটারমশায়কে জিজ্ঞেস করে জেনে নিতে। প্ল্যাটনারের বক্তৃতা মন দিয়ে শুনত হুইল–কখনও সখনও রকমারি দ্রব্য এনে দিত প্ল্যাটনারকে। সুযোগ পেয়ে উৎসাহে ফুলে উঠত প্ল্যাটনার। বিশ্লেষণ করত, মতামতও শোনাত। বাড়ি বসে অ্যানালিটিক্যাল কেমিস্ট্রিও পড়ে নিয়েছিল। অবাক হয়েছিল কেমিস্ট্রি শাস্ত্রের মধ্যে এত কৌতূহলোদ্দীপক বিষয় আছে জেনে।

এতক্ষণ পর্যন্ত গেল কাহিনির মামুলি বয়ান। এবার আসছে সবুজ গঁড়োর বৃত্তান্ত। কপাল খারাপ, সবুজ গুড়োটা পাওয়া গিয়েছিল কোত্থেকে–তা জানা যায়নি। শ্রীমান হুইল কষ্টেসৃষ্টে ইনিয়েবিনিয়ে শুনিয়েছিল একটা পেঁচালো কাহিনি। ডাউন্সের একটা পরিত্যক্ত চুনের ভাটিতে নাকি পেয়েছিল সবুজ গঁড়োর একটা মোড়ক। তখনই মোড়কটা দেশলাইয়ের কাঠি ধরিয়ে জ্বালিয়ে দিলে ল্যাটা চুকে যেত। প্ল্যাটনারের উপকার হত, হুইবলের বাড়ির লোকেরও উচিত শিক্ষা হত। কিন্তু মোড়কে করে সে সবুজ গুঁড়ো আনেনি স্কুলে–এনেছিল একটা আট আউন্স মাপের ওষুধের শিশিতে–মুখটা বন্ধ করেছিল চেবানো খবরের কাগজের ছিপি এঁটে। বৈকালিক বিদ্যালয় শেষ হলে দিয়েছিল প্ল্যাটনারকে। সেদিন চারটি ছেলেকে প্রার্থনার পর আটকে রাখা হয়েছিল স্কুলে পড়া না করতে পারার অপরাধে। দেখাশোনার ভার ছিল প্ল্যাটনারের ওপর। কেমিস্ট্রি পড়ানোর ঘরে কর্তব্য সমাপন করছিল প্ল্যাটনার। আর পাঁচটা বেসরকারি স্কুলের মতো এ স্কুলেও হাতেকলমে কেমিস্ট্রি শেখানোর সরঞ্জাম নিতান্তই সাদাসিধে, ট্রাঙ্ক সাইজের একটা আলমারির মধ্যে ছিল জিনিসগুলো। ফাঁকিবাজ ছাত্রদের ওপর তদারকি বড় একঘেয়ে লাগছিল প্ল্যাটনারের। হুইবল সবুজ গুঁড়ো নিয়ে আসায় তাই খুশি হয়েই তৎক্ষণাৎ আলমারির তালা খুলে বার করেছিল বিশ্লেষণ করার জিনিসপত্র। ভাগ্যক্রমে হুইবল বসেছিল নিরাপদ দূরত্বে। ফাঁকিবাজ ছেলে চারটে মন দিয়ে বাকি পড়া করার ভান করে আড়চোখে চেয়েছিল। প্ল্যাটনারের দিকে। কারণ, মাত্র তিনটে গ্যাসের বিদ্যেবুদ্ধি নিয়ে কেমিক্যাল এক্সপেরিমেন্টের ব্যাপারে নিতান্তই দুঃসাহসী ছিল হঠকারী মাস্টারমশাই। ভয় আর ঔৎসুক্য সেই কারণেই।

পাঁচটা ছেলেই বলেছে একই কথা। প্রথমে অল্প সবুজ গুঁড়ো একটা টেস্টটিউবে ঢেলে নিয়েছিল প্ল্যাটনার। পর্যায়ক্রমে পরীক্ষা করেছিল জল, হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড, নাইট্রিক

অ্যাসিড আর সালফিউরিক অ্যাসিড দিয়ে। কিছু ঘটেনি। সবুজ গুঁড়ো সবুজই থেকেছে। তখন একটা স্লেটের ওপর শিশির অর্ধেক সবুজ গুড়ো ঢেলে নেয় প্ল্যাটনার। ওষুধের শিশিটা বাঁ হাতে ধরে, ডান হাতে দেশলাইয়ের কাঠির আগুন লাগায় সবুজ ডোয়। ধোঁয়া ছেড়ে গলতে থাকে সবুজ গুঁড়ো। আর তারপরেই ফেটে যায় কানের পরদা-ফাটানো শব্দে প্রচণ্ড ঝলকে চোখ ধাঁধিয়ে দিয়ে। ঝলক দেখেই বিপর্যয়ের আশঙ্কায় পাঁচটা ছেলেই গোঁত মেরে ঢুকে গিয়েছিল ডেস্কের তলায়। মারাত্মক জখম হয়নি কেউই। জানলা ছিটকে পড়েছিল খেলার মাঠে, আস্ত থাকেনি ইজেলের ওপর রাখা ব্ল্যাকবোর্ড। রেণু রেণু হয়ে গিয়েছিল স্লেটখানা। কড়িকাঠ থেকে খসে পড়েছিল পলেস্তারা। এ ছাড়া স্কুলবাড়ির বা যন্ত্রপাতির কোনও ক্ষতি হয়নি। প্ল্যাটনারকে দেখতে না পেয়ে ছেলেরা ভেবেছিল, নিশ্চয় বিস্ফোরণের সংঘাতে জ্ঞান হারিয়েছে মাস্টারমশাই-পড়ে আছে চোখের আড়ালে ডেস্কের তলায়। লাফিয়ে বেরিয়ে এসে তন্নতন্ন করে খুঁজেও কিন্তু ঘরের মধ্যে প্ল্যাটনারকে দেখতে না পেয়ে তাজ্জব হয়ে গিয়েছিল পাঁচজনেই। ঘর শূন্য–প্ল্যাটনার উধাও! তবে কি জখম হয়ে প্রাণের তাগিদে বাইরে ছিটকে গেছে মাস্টারমশাই? কানে তখনও তালা লেগে রয়েছে। পাঁচজনেরই, চোখে দেখছে ধোঁয়া। সেই অবস্থাতেই হুড়মুড় করে দরজা দিয়ে বেরতে গিয়ে দড়াম করে আছড়ে পড়েছিল প্রিন্সিপ্যাল মি. লিডগেটের ওপর–প্রলয়ংকর বিস্ফোরণে পুরো স্কুলবাড়ি থরথর করে কেঁপে ওঠায় ভদ্রলোক পড়ি কি মরি করে দৌড়ে আসছিলেন কেমিস্ট্রির ঘরে।

একটুতেই ধাঁ করে উত্তেজিত হয়ে ওঠা যাঁর স্বভাব, পিলে চমকানো এই শব্দের পর তাঁর অবস্থাটা অনুমেয়। গায়ের ওপর দমাদম করে ছেলে পাঁচটা আছড়ে পড়ায় তিড়বিড়িয়ে উঠেছিলেন একচোখো প্রিন্সিপ্যাল। গালাগাল বর্ষণ করেই জানতে চেয়েছিলেন, মি. প্ল্যাটনার কোথায়?

পরের কটা দিন এই একই প্রশ্ন শোনা গেছে মুখে মুখে। গেল কোথায় মি. প্ল্যাটনার? পরমাণু হয়ে গেল নাকি? না আছে এক ফোঁটা রক্ত, না আছে জামাকাপড়ের কণামাত্র সুতো। বিস্ফোরণ যেন তাকে একেবারেই নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে–ধ্বংসাবশেষটুকুও রেখে যায়নি।

ফলে চাঞ্চল্যকর গুজব ছড়িয়ে পড়েছিল পুরো তল্লাটে। ধামাচাপা দেওয়ার অনেক চেষ্টা করেছিলেন লিডগেট। প্ল্যাটনারের নাম মুখে আনলেই ছাত্রদের পঁচিশ লাইন লেখার সাজা দিয়েছিলেন। ক্লাসে বলতেন, প্ল্যাটনার কোথায় আছে, তা তিনি জানেন। কেমিক্যাল এক্সপেরিমেন্ট করতে গিয়ে এহেন বিপর্যয়ের ফলে স্কুলের সুনামের হানি ঘটতে পারে, প্ল্যাটনারের অন্তর্ধান রহস্যও স্কুলের নাম ডোবাতে পারে–এই ভয়ে তিনি পুরো ব্যাপারটাকে সহজ করে তুলতে চেয়েছিলেন। ছেলে পাঁচটাকে এমন জেরা করেছিলেন যে, চোখে দেখা ঘটনাকেও শেষ পর্যন্ত চোখের ভ্রান্তি মনে হয়েছিল তাদের কাছে। তা সত্ত্বেও পল্লবিত কাহিনি তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল পুরো নটা দিন এবং বেশ কজন অভিভাবক ছেলেদের সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল স্কুল থেকে বিভিন্ন অজুহাতে। প্রতিবেশীরা নাকি স্বপ্ন দেখেছিল প্ল্যাটনারকে। সুস্পষ্ট স্বপ্নগুলো অদ্ভুতভাবে একই রকম। প্রতি ক্ষেত্রেই দেখা গেছে, রামধনুর মতো বর্ণবিকাশী ঝকঝকে আলোকপ্রভার মধ্যে হেঁটে চলেছে। প্ল্যাটনার–কখনও একা, কখনও বহু সঙ্গীসহ, মুখ ফ্যাকাশে, উদ্ভ্রান্ত, বিমর্ষ, কয়েক ক্ষেত্রে হাত নেড়ে কী যেন বলতে চেয়েছে স্বপ্ন যে দেখছে, তাকে। কয়েকটি ছেলের স্বপ্ন আরও বিদঘুটে। প্ল্যাটনার যেন অবিশ্বাস্য দ্রুতবেগে কাছে এসে চোখে চোখে চেয়ে রয়েছে। দুঃস্বপ্নের প্রভাব নিঃসন্দেহে। কয়েকজন ছাত্র প্ল্যাটনারকে নিয়ে চম্পট দিয়েছে স্বপ্নের মধ্যে–কেননা, কারা যেন ধরতে আসছে প্ল্যাটনারকে। তাদের স্পষ্ট দেখা

যাচ্ছে না। শুধু বোঝা গেছে, এরকম গোল গোল আকারের কিম্ভুতকিমাকার প্রাণী ইহলোকের এই ধরাধামে কখনও কেউ দেখেনি। নদিন পর বুধবারে প্ল্যাটনার ফিরে আসতেই অবসান ঘটেছিল সমস্ত জল্পনা-কল্পনার। তার ফিরে আসাটাও উধাও হওয়ার মতোই চমকপ্রদ। বুধবার সন্ধ্যায় বাগানে লিচু পেড়ে খাচ্ছিলেন মি. লিডগেট। বেশ বড় বাগান। আইভি ছাওয়া উঁচু লাল ইটের পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। বাইরে থেকে ভেতরের দৃশ্য দেখা যায় না। ফলভারে নুয়ে-পড়া বিশেষ একটা গাছের দিকে যেই মন দিয়েছেন ভদ্রলোক, অমনি তীব্র ঝলক দেখা দিয়েছিল শূন্যে, ধুপ করে শোনা গিয়েছিল একটা ভারী আওয়াজ। ঘুরে তাকানোর আগেই একটা গুরুভার বস্তু আছড়ে পড়েছিল পিঠে। প্রচণ্ড ধাক্কায় ভদ্রলোক হাতে লিচু নিয়েই মুখ থুবড়ে পড়েছিলেন বাগানের মাটিতে– সিল্কের টুপি কপালে এঁটে বসে গিয়ে ঢেকে দিয়েছিল একটিমাত্র চোখের বেশ কিছুটা, পিঠে আছড়ে-পড়া বস্তুটা হঠাৎ করে হড়কে গিয়ে লিচু গাছের ওপরে পড়তেই চার হাত-পায়ে ভর দিয়ে উঠে বিমূঢ় মি. লিডগেট দেখেছিলেন নিখোঁজ প্ল্যাটনার সটান বসে তাঁর সামনে। মাথায় টুপি নেই। জামাকাপড় এবং চুল লন্ডভন্ড। শার্টের কলার উধাও। হাতে রক্ত, চটকানো লিচু মুঠোয় ধরে ওই অবস্থাতেই রেগে টং হয়ে প্ল্যাটনারকে নাকি একহাত নিয়েছিলেন প্রিন্সিপ্যাল মশায় এহেন অভব্য আচরণের জন্যে।

প্ল্যাটনার উপাখ্যানের এই গেল বাহ্যিক বর্ণনা। মি. লিডগেট তাকে চাকরি থেকে কীভাবে এবং কী অজুহাতে বরখাস্ত করেছিলেন, তার বিশদ বিবরণ নিষ্প্রয়োজন। অস্বাভাবিক কাণ্ডকারখানার তদন্ত সমিতির প্রতিবেদনে পাওয়া যাবে খুঁটিনাটি। প্রথম দু এক দিনে তার ডানদিক-বাঁদিক বদলাবদলির অত্যাশ্চর্য ব্যাপারটাও তেমনভাবে কারও নজরে পড়েনি। প্রথম খটকা লেগেছিল ব্ল্যাকবোর্ডে ডানদিক থেকে বাঁদিকে লেখবার সময়ে। নতুন চাকরিতে সুনাম ক্ষুণ্ণ হতে পারে, এই ভয়ে বিষয়টা প্রাণপণে চেপে দেওয়ার চেষ্টা

করেছিল প্ল্যাটনার। কয়েক মাস পরে ধরা পড়েছিল, তার হৃদযন্ত্রও চলে এসেছে বিপরীতদিকে। আরক প্রভাবে সংজ্ঞা লোপ করে দাঁত তোলবার সময়ে ধরা পড়ে এই অদ্ভুত ব্যাপার। প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও শল্যচিকিৎসকরা তাকে পরীক্ষা করে এবং সংক্ষিপ্ত বিবরণ ছাপিয়ে দেয় শারীরস্থান পত্রিকায়। বস্তুভিত্তিক ঘটনাবলির পরিসমাপ্তি এইখানেই। এবার আসা যাক প্ল্যাটনার নিজে যে কাহিনি শুনিয়েছিল–তার বর্ণনায়।

তার আগে একটা ব্যাপার পরিষ্কার করে নেওয়া যাক। এই পর্যন্ত যা লেখা হল তা সাক্ষ্যপ্রমাণের জোরে আদালতগ্রাহ্য। কিন্তু এরপর যা লেখা হবে, তা প্ল্যাটনারের নিজের কথা। বিশ্বাস করা কঠিন। পাঠক-পাঠিকার মর্জির ওপর ছেড়ে দেয়া যাক। জড়জগতের বাইরে সূক্ষ্ম আত্মিক জগতে কী ঘটতে পারে, তা নিয়ে কারও বিশ্বাস উৎপাদন করার অভিপ্রায় আমার নেই। আমি শুধু লিখে যাব প্ল্যাটনার যা বলেছিল, তার প্রতিটি কথা। শোনবার পর কিন্তু মনে হতে পারে, প্ল্যাটনার এই নটা দিন ছিল স্থান-এর বাইরে–ভেতরে নয় এবং ফিরে এসেছে দর্পণ প্রতিবিম্বিত প্রতিচ্ছবির মতোই উলটো অবস্থায়।

বিস্ফোরণের ফলে মৃত্যু হয়েছে, এইটাই তার মনে হয়েছিল প্রথমে। দেহটা ছিটকে উঠেছে শূন্যে, যাচ্ছে প্রবলবেগে পেছনদিকে। ভেবেছিল, বুঝি সবেগে আছড়ে পড়বে ব্ল্যাকবোর্ডের ইজেল বা কেমিস্ট্রির কাবার্ডের ওপর। সংঘাতে তখনও মাথা বোঁ বোঁ করে ঘুরছে। নাকে পোড়া চুলের গন্ধ আসছে। মনে হয়েছিল যেন লিডগেটের ধমকও কানে ভেসে আসছে। আসলে মাথার ঠিক ছিল না।

ক্লাসঘরের মধ্যেই রয়েছে প্ল্যাটনার, এই মনে হওয়াটা কিন্তু অত্যন্ত সুস্পষ্ট। টের পেয়েছে ছেলেদের হতভম্ব অবস্থা এবং লিডগেটের প্রবেশ। না, এ ব্যাপারে কোনও

ধোঁয়াটে ভাব নেই প্ল্যাটনারের বর্ণনায়, কথাবার্তা, চেঁচামেচি কিন্তু একেবারেই শুনতে পায়নি–নিশ্চয় আওয়াজের চোটে কানে তালা লেগে গিয়েছিল বলে। অদ্ভুত আবছা আর গাঢ় মনে হয়েছিল চারপাশ–বিস্ফোরণের ফলে নিশ্চয় তাল তাল ধোঁয়া ছড়িয়ে পড়েছিল বলে। এসবই প্ল্যাটনারেরই অনুমান–ব্যাখ্যা করার প্রচেষ্টা। অস্পষ্টতার মধ্যে ভৌতিক ছায়ার মতো নিঃশব্দে আবছাভাবে নড়েচড়ে বেড়াচ্ছিল ছেলে পাঁচটা আর লিডগেট। প্ল্যাটনারের মুখের চামড়া ঝলসে গিয়েছিল বিস্ফোরণের ঝলকে–জ্বালা করছিল। মাথা ঘুরছিল। সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছিল। কেবলই মনে হচ্ছিল, নিশ্চয় চোখের বারোটা বেজে গেছে, কানেরও দফারফা হয়ে গেছে। হাত-পা-মুখও যেন বশে নেই। একটু একটু করে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল অনুভূতি। অবাক হয়েছিল আশপাশে চেনা ডেস্ক আর স্কুলের আসবাবপত্র না দেখে। তার বদলে রয়েছে আবছা, অনিশ্চিত ধূসর কতকগুলো আকৃতি, তারপরেই আঁতকে উঠেছিল, বিষম চিৎকার বেরিয়ে এসেছিল গলা চিরে। মুহূর্তে সজাগ হয়ে উঠেছিল অসাড় চৈতন্য। পিলে চমকানোর মতো ঘটনা! দুটি ছেলে নাকি হাত-মুখ নাড়তে নাড়তে সটান তাকে ছুঁড়ে হেঁটে চলে গিয়েছিল। বিন্দুমাত্র টের পায়নি প্ল্যাটনারের অস্তিত্ব–দেখেওনি। পরক্ষণেই তাল তাল কুয়াশা ঘিরে ধরেছিল তাকে। সেই মুহূর্তের মানসিক অবস্থা বাস্তবিকই অবর্ণনীয়–কালঘাম ছুটে গিয়েছিল বেচারির ঘটনাটা বলবার সময়ে। সে যে আর বেঁচে নেই, এ ধারণাটা মাথায় এসেছিল তখনই। তা-ই যদি হবে তো দেহটা এখনও সঙ্গে রয়েছে কেন? ভেবে কূল পায়নি প্ল্যাটনার, তাহলে কি মৃত্যুটা তার হয়নি, হয়েছে বাদবাকি সবাইয়ের স্কুল উড়ে গিয়েছে বিস্ফোরণে, সে ছাড়া অক্কা পেয়েছে। প্রত্যেকেই? তা-ই বা হয় কী করে! মহাধাঁধায় পড়েছিল প্ল্যাটনার।

অস্বাভাবিক আঁধারে আশপাশের দৃশ্য স্পষ্ট দেখতেও পায়নি। আবলুশ কাঠের মতো কালো আঁধারের মধ্যে দিয়ে মাথার ওপর দেখা যাচ্ছিল কালো চাঁদোয়া। আকাশের এক

কোণে ফিকে সবুজ দ্যুতি। সবুজ প্রভায় দিগন্তে দেখা যাচ্ছে ঢেউখেলানো কালো পাহাড়। অন্ধকারে চোখ সয়ে যাওয়ার পর মালুম হয়েছিল, একটা ক্ষীণ সবুজ রং রাতের কালো অমানিশার সঙ্গে বেশ পৃথকভাবেই যেন পরিব্যাপ্ত রয়েছে আকাশ-বাতাসে। সবুজ রং আর কালো রাতের এই বিচিত্র সমন্বয়ের পটভূমিকায় ফসফরাস দ্যুতিময় প্রেতচ্ছায়ার মতো ফুটে উঠেছে ক্লাসঘরের আসবাবপত্র, ছেলে পাঁচটা এবং প্রিন্সিপ্যাল, ঠিক যেন অতিসূক্ষ্ম ছবি–ছুঁয়ে অনুভব করা যায় না–এত মিহি।

এক হাত বাড়িয়ে ফায়ারপ্লেসের দেওয়াল ছুঁতে গিয়েছিল প্ল্যাটনার-হাত গলে গিয়েছিল দেওয়ালের মধ্যে দিয়ে অনায়াসেই। অনেক চেষ্টা করেছিল দুজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করার। গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে ডেকেছিল লিডগেটকে। ছেলে পাঁচটা যতবার আশপাশ দিয়ে গিয়েছে, ক্যাঁক করে চেপে ধরার চেষ্টা করেছে। নিবৃত্ত হয়েছে মিসেস লিডগেট ঘরে ঢোকার পর। ভদ্রমহিলাকে দুচক্ষে দেখতে পারত না প্ল্যাটনার। আশ্চর্য, সেই সবুজাভ জগতের মধ্যে থেকেও সে যেন সেই জগতের কেউ নয়–যেন কোনও যোগাযোগই নেই সবুজ অথচ তমালকালো বিচিত্র ছায়ামায়ার সঙ্গে–অদ্ভুত সেই অনুভূতি অস্বাভাবিক অস্বস্তির সৃষ্টি করেছিল প্ল্যাটনারের অণু-পরমাণুতে। শিকার ধরার জন্য ওত পেতে বসে থাকা বেড়ালের মতো মনে হয়েছিল নিজেকে। চেনা অথচ অল্প পারিপার্শ্বিক জগতের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের সব চেষ্টাই ব্যর্থ হয়েছে; একটা অদৃশ্য, অবোধ্য বাধা বাক্যালাপে বাধার সৃষ্টি করে গেছে।

তিতিবিরক্ত হয়ে মন দিয়েছে নিরেট পরিবেশের দিকে। সবুজ গুঁড়োর কিছুটা তখনও ছিল শিশির মধ্যে, শিশি ছিল হাতের মুঠোয়। পকেটে রেখেছিল প্ল্যাটনার। আশপাশ হাতড়াতে গিয়ে মনে হয়েছিল যেন বসে রয়েছে মখমল কোমল শেওলা-ছাওয়া পাথরের

ওপর। চারপাশের তমিস্রাময় জায়গাটার কিছুই চোখে পড়েনি–ক্লাসঘরের ক্ষীণ, কুয়াশাচ্ছন্ন ছবিতে ঢাকা পড়ে গিয়েছিল। কিন্তু গায়ে হিমেল হাওয়া লাগায় আন্দাজ করে নিয়েছিল, বসে রয়েছে সম্ভবত পাহাড়ের ওপর–পায়ের তলায় রয়েছে বহু দূর বিস্তৃত একটা উপত্যকা। আকাশপ্রান্তের সবুজ আভা ছড়িয়ে পড়ছে একটু একটু করে, বাড়ছে। তীব্রতা। উঠে দাঁড়িয়ে দুহাতে চোখ ডলেছিল প্ল্যাটনার।

কয়েক পা এগিয়েই হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল ঢালু পাহাড়ে। উঠে বসেছিল এবড়োখেবড়ো একটা পাথরে। নির্নিমেষে চেয়ে ছিল সবুজ উষার দিকে। অন্তরাত্মা দিয়ে উপলব্ধি করেছিল, আশপাশের সেই বিচিত্র দুনিয়ায় শব্দ নেই কোথাও–নিস্তব্ধ আকাশ-বাতাস। হাওয়া বইছে নিচ থেকে, কনকনে ঠান্ডা হাওয়া। অথচ কানে ভেসে আসছে না বাতাসে আন্দোলিত পত্রমর্মর, ঘাসের খসখসানি, ঝোপঝাড়ের দীর্ঘশ্বাস। বসে আছে পরিত্যক্ত পাথুরে অঞ্চলে–খাঁ খাঁ করছে চারদিক। অন্ধকারে দেখতে না পেলেও কানে কিছু না শোনার ফলে অন্তত মনে হয়েছে সেইরকম। তীব্র থেকে তীব্রতর হয়েছে আকাশপ্রান্তের সবুজ আভা, সেই সঙ্গে একটু একটু করে একটা টকটকে রক্তলাল আভা ছড়িয়ে পড়েছে কালো চাঁদোয়ার মতো আকাশে–কিন্তু সবুজ রঙের রঙ্গে লাল রং মিশে একাকার হয়ে যায়নি। সবুজ আর লালের দ্যুতিতে ছমছমে হয়ে উঠছিল পরিবেশ–ভয়ানক দ্যুতি একটু একটু করে স্পষ্টতর করে তুলছিল দশদিকের ধু ধু শূন্যতা। আমার মনে হয়, এই লালাভ ভাবটা চোখের ভ্রান্তি ছাড়া কিছুই নয়। হলদেটে-সবুজ আকাশপ্রান্তে ক্ষণেকের জন্যে ঝটপট করে উঠেছিল কালোমতো একটা বস্তু। তারপরেই পায়ের তলায় ব্যাদিত শূন্যতার মধ্যে ধ্বনিত হয়েছিল খুব মিহি কিন্তু তীক্ষ্ণ একটা ঘণ্টার শব্দ। ক্রমবর্ধমান আলোর মধ্যে একটা অসহ্য প্রত্যাশার উৎকণ্ঠা সাপের মতোই পেঁচিয়ে ধরেছিল প্ল্যাটনারের সত্তাকে।

বোধহয় ঘণ্টাখানেক এইভাবে কাঠের পুতুলের মতো কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় বসে ছিল সে। সভয়ে দেখেছে, একটু একটু করে বেড়েই চলেছে অদ্ভুত সবুজ আলো, মন্থর গতিতে সর্পিল আঙুল মেলে ধরছে মাথার ওপরকার খ-বিন্দুর দিকে। আলো বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের এই জগতের অপচ্ছায়ার মতো দৃশ্য কোথাও একেবারেই অস্পষ্ট হয়ে এসেছে, কোথাও অস্পষ্টতর হয়েছে। পার্থিব সূর্যাস্তের দরুনই বোধহয় এরকম সহাবস্থান দেখা গেছে। অর্থাৎ এখানে যখন সূর্য ডুবছে, ওখানে তখন আলো ফুটছে। সবুজ আর লাল রঙের অমন আশ্চর্য খেলা তাই রোমাঞ্চিত করছে প্ল্যাটনারকে–পার্থিব এবং অপার্থিবের সন্ধিক্ষণে উপস্থিত থেকে শুধু শিহরিত হয়েছে–কার্যকারণ নির্ণয় করতে পারেনি। কয়েক পা নেমে এসেছিল প্ল্যাটনার ভ্যাবাচ্যাকা ভাবটা কাটিয়ে ওঠবার জন্যে। বিস্ময় আরও বেড়েছে–কমেনি। মনে হয়েছে যেন দাঁড়িয়ে রয়েছে নিচের তলার বড় ক্লাসঘরের শূন্যে বাতাসের মধ্যে। পায়ের তলায় সান্ধ্য ক্লাস নিয়ে ব্যস্ত লিডগেট এবং ছাত্ররা। ইউক্লিডের জ্যামিতি থেকে টুকলিফাই করছে ছেলেরা। আস্তে আস্তে এ দৃশ্যও ফিকে হয়ে এসেছিল সবুজ উষা স্পষ্টতর হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে।

প্ল্যাটনার তখন দৃষ্টিচালনা করেছিল নিচের উপত্যকার দিকে। দেখেছিল, সবুজ আলো পৌঁছেছে পাহাড়ের গা পর্যন্ত। খাদের নিবিড় আঁধার ভেঙে যাচ্ছে সূক্ষ্ম সবুজ আভায়–জোনাকির আলোয় যেভাবে অন্ধকার সরে সরে যায়–সেইভাবে। একই সঙ্গে দূরের পাহাড়ের ঢেউখেলানো আগ্নেয় শিলা স্পষ্ট হয়ে উঠছে সবুজ রং-মাখা আকাশ আরও ওপরে উঠে যাওয়ার ফলে। দৈত্যাকার শৈলশ্রেণি অন্ধকার ফুড়ে জাগ্রত হচ্ছে একে একে লাল, সবুজ, কালো ছায়ার চাদর মুড়ি দিয়ে। হাওয়ায় উঁচু জমির ওপর দিয়ে থিলডাউন কাঁটাগাছ ভেসে যাওয়ার মতো অদ্ভুত গোল বলের মতো রাশি রাশি বস্তু ভেসে যেতে

দেখেছিল প্ল্যাটনার এই সময়ে। কাছে নয়–দূরে, খাদের ওপারে। পায়ের তলায় ঘন্টাধ্বনি অধীর হয়ে উঠেছে যেন ঠিক তখনই–মুহুর্মুহু টং-টং শব্দ ছড়িয়ে গেছে দিকে দিকে, এদিকে-সেদিকে দেখা গেছে কয়েকটা সঞ্চরমাণ আলো। ডেস্কে আসীন ছেলেগুলো আরও ফিকে হয়ে এসেছে–আবছা আকৃতি দেখতে হয়েছে অতিকষ্টে–চোখে না-পড়ার মতোই।

অন্য জগতের সবুজ সূর্য যখন উঠছে, আমাদের এই জগৎ তখন লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। দেখে, ধাঁধায় পড়েছিল প্ল্যাটনার। অন্য দুনিয়ার রাত্রে হাঁটাচলা কঠিন এই দুনিয়ার দৃশ্য সুস্পষ্ট থাকার ফলে। প্রহেলিকা সেইখানেই। এই দুনিয়া থেকে অন্য দুনিয়ার ছবি চোখে ধরা না-পড়ার কোনও ব্যাখ্যা প্ল্যাটনার আবিষ্কার করতে পারেনি। সেই জগৎ থেকে যদি এ জগৎ দেখা যায় ছায়ার মতো, এ জগৎ থেকে সেই জগৎ কেন দেখা যাবে না ছায়ার মতো? সম্ভবত সেই জগতের চাইতে এই জগতে আলোর তীব্রতা বেশি বলে–এখানকার সবকিছুই বেশি আলোক সমুজ্জ্বল বলে। প্ল্যাটনার দেখেছে, সেই জগতের ভরদুপুর এই জগতের মাঝরাতের জ্যোৎস্নার মতো। সেই জগতের মাঝরাত একেবারেই আঁধারে ঢাকা। নিবিড় অন্ধকারে ফিকে ফসফরাস-দ্যুতি যেমন দৃশ্যমান, মোটামুটি অন্ধকার ঘরে অন্য দুনিয়ার সবকিছুই তেমনি অদৃশ্য। ওর কাহিনি এবং ব্যাখ্যা শোনবার পর ফোটোগ্রাফারের ডার্করুমে রাতের অন্ধকারে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থেকেছি অন্য দুনিয়ার চেহারা দেখবার অভিপ্রায়ে। সবুজাভ চড়াই-উতরাই আর পাহাড় দেখেছি ঠিকই কিন্তু অত্যন্ত অস্পষ্টভাবে। পাঠক-পাঠিকারা হয়তো আরও বেশি দেখতে পাবেন। সেই দুনিয়া থেকে ফিরে আসার পর স্বপ্নে নাকি সেখানকার অনেক জায়গা দেখে চিনতে পেরেছিল প্ল্যাটনার–কিন্তু সেটা স্মৃতির কারসাজিও হতে পারে। চারপাশের এই অদ্ভুত অন্য দুনিয়ার চকিত আভাস তীক্ষ্ণ দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিদের চোখে পড়ে যাওয়াটা খুব একটা অসম্ভব না-ও হতে পারে।

অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ে চলে আসছি। সবুজ সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে প্ল্যাটনারের চোখের সামনে ভেসে উঠেছিল একটা টানা লম্বা রাস্তার দুধারে কালো বাড়ির সারি। স্পষ্ট নিকেতনের পর নিকেতন। খাদের মধ্যে। দ্বিধায় পড়েছিল প্ল্যাটনার–টহল দিয়ে আসাটা কি উচিত হবে? তারপর পা বাড়িয়েছিল দ্বিধা ঝেড়ে ফেলে। খাড়াই পথ বেয়ে নেমে এসেছিল পাহাড়ের গা দিয়ে। কালঘাম ছুটে গিয়েছিল নামবার সময়ে। পাহাড়ি পথ এমনিতেই বন্ধুর, তার ওপর ছড়ানো রয়েছে আলগা নুড়ি। তেমনি খাড়াই। ঘণ্টাধ্বনি তখন থেমেছে। নিস্তব্ধ সেই অন্য দুনিয়ায় ওর পায়ের শব্দ ছাড়া আর কোনও শব্দ নেই। পায়ের ঠোক্করে ঠিকরে যাচ্ছে। শিথিল প্রস্তরখণ্ড। আগুন ঠিকরে যাচ্ছে পায়ের তলায়। কাছে আসতেই খটকা লেগেছিল প্ল্যাটনারের। এ কী আশ্চর্য সাদৃশ্য! রাস্তার দুধারে প্রতিটা বাড়িই কবর-প্রস্তর, স্মৃতিসৌধ, সমাধিমন্দিরের মতো দেখতে–তবে সাদা নয়–কালো। একই রকমের কালো আঁধার জমাট করে যেন নির্মিত গোরস্থানের মৃত্যুপুরী। তারপরেই চোখে পড়েছিল, সবচেয়ে বড় বাড়িটা থেকে পিলপিল করে বেরিয়ে আসছে ম্যাড়মেড়ে, ফিকে সবুজ, গোলাকার বহু মূর্তি –ঠিক যেন গির্জার মধ্যে থেকে বেরচ্ছে ভক্তরা। ছড়িয়ে পড়ছে প্রশস্ত পথের দুপাশের অলিগলিতে। কাউকে দেখা যাচ্ছে গলি থেকে বেরিয়ে খাড়াই পাহাড় বেয়ে উঠতে, কেউ কেউ ঢুকছে পথের দুপাশে ছোট ছোট মসিবর্ণ বাড়িগুলোয়। প্ল্যাটনারের দিকেই অদ্ভুত গোলাকার সবুজ বস্তুগুলো ভাসতে ভাসতে উঠে আসছিল। দেখেই থমকে দাঁড়িয়ে গিয়ে বিস্ফারিত চোখে চেয়ে ছিল সে। পালে পালে যারা আসছে, তাদের কেউই কিন্তু হেঁটে আসছে না–হাত-পা-জাতীয় কোনও প্রত্যঙ্গই নেই তাদের; আকারে তারা মানুষের মাথার মতো–তলায় ঝুলছে ব্যাঙাচির মতো সরু একটা দেহ। ঝুলছে আর দুলে দুলে উঠছে। না, ভয় পায়নি প্ল্যাটনার। বিষম অবাক হয়ে গিয়েছিল বলেই মনে ভয় ঠাঁই পায়নি। এরকম সৃষ্টিছাড়া জীব সে জীবনে দেখেনি–

কল্পনাতেও আনা যায় না। পাহাড়ের গা বেয়ে ওপরের দিকে বয়ে আসা কনকনে হিমেল হাওয়ায় গা ভাসিয়ে তারা উঠে আসছিল নিঃশব্দে–ঠিক যেন দমকা হাওয়ায় ভেসে আসছে রাশি রাশি সাবানের বুদবুদ। সবচেয়ে কাছের প্রাণীটির দিকে তাকিয়ে চক্ষুস্থির হয়ে গিয়েছিল প্ল্যাটনারের। সত্যি তা একটা মানুষের মুন্ডু! চোখ দুটো কেবল আশ্চর্য রকমের বিশাল। আত্যন্তিক বিষাদ আর নিদারুণ মনস্তাপ ভাসছে দুই চোখে-মরজগতের কোনও প্রাণীর চোখে এহেন ক্লিষ্ট ভাব দেখেনি প্ল্যাটনার। অবাক হয়েছিল ভাসমান মুন্ডুদের চাহনি অন্যদিকে রয়েছে লক্ষ করে। প্ল্যাটনারকে দেখছে না কেউই নির্নিমেষে চেয়ে রয়েছে এমন কিছুর দিকে, যা দেখা যাচ্ছে না। প্রথমটায় ধাঁধায় পড়েছিল সে। তারপরেই মনে হয়েছিল, অসম্ভব এই প্রাণীরা বিশাল চোখ মেলে ছেড়ে আসা এই দুনিয়ার কোনও কিছুর দিকে চেয়ে আছে নিষ্পলকে–খুবই কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনা; যা ওদের চোখে স্পষ্ট, প্ল্যাটনারের চোখে নয়। আরও কাছে এগিয়ে এসেছিল ভাসমান বর্তুলাকার ব্যাঙাচি দেহওয়ালা আজব প্রাণীরা–বিষম বিস্ময়ে চেঁচাতেও ভুলে গিয়েছিল প্ল্যাটনার। কাছাকাছি আসতে একটা বিরক্তি প্রকাশের খিটখিটে মেজাজের শব্দও কানে ভেসে এসেছিল–খুবই অস্পষ্ট–যেন চাপা অসন্তোষ ক্ষীণ কম্পন সৃষ্টি করে চলেছে অন্য দুনিয়ার বায়ুমণ্ডলে। আরও কাছে এসেই আলতোভাবে প্ল্যাটনারের মুখে ঝাপটা মেরে পাশ কাটিয়ে ভেসে গিয়েছিল পাহাড়চূড়ার দিকে! ঝাপটাটা মৃদু, কিন্তু বরফের মতো কনকনে।

একটা মুন্ডুই মুখ চাপড়ে দিয়ে গিয়েছিল প্ল্যাটনারের। কেন জানি ওর মনে হয়েছিল, বিশেষ এই মুন্ডুটার সঙ্গে লিডগেটের মুন্ডুর সাদৃশ্য আছে দারুণভাবে। অন্য মুন্ডুরা ঝাঁকে ঝাঁকে তখন উঠে যাচ্ছে ওপরদিকে। প্ল্যাটনারকে চিনতে পেরেছে, এমন ভাব প্রকাশ পায়নি কারওই চোখে। দু-একটা মুন্ডু ওর খুব কাছাকাছি এসেছিল, প্রথম মুন্ডুর মতো

ঝাপটা মারতেও গিয়েছিল–প্রতিবারেই তিড়বিড়িয়ে উঠে শরীর কুঁচকে নিয়ে তফাতে সরে গিয়েছিল প্ল্যাটনার। প্রত্যেকের চোখেই কিন্তু একই সীমাহীন পরিতাপের অভিব্যক্তি দেখেছিল প্ল্যাটনার। একই রকমের নিঃসীম বিরক্তির ক্ষীণ গজগজানি ভেসে এসেছিল কানে। দু-একজনকে কাঁদতেও দেখেছিল। একজনকে দেখেছিল পৈশাচিক ক্রোধে প্রচণ্ড বেগে সাঁত করে পাশ কাটিয়ে ওপরে ধেয়ে যেতে। বাদবাকি সকলেই নিরুত্তাপ, নির্বিকার। কয়েকজনের চোখে অবশ্য দেখা গিয়েছিল পরিতৃপ্ত আগ্রহ। বিশেষ করে একজনের চোখে সুখ যেন ফেটে পড়ছিল! এর বেশি আর কিছু দেখেছে বলে মনে নেই প্ল্যাটনারের।

বেশ কয়েক ঘণ্টা এই দৃশ্য দেখেছিল সে। দলে দলে ভাসমান বর্তুলাকার প্রাণী বেরিয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে পাহাড়চূড়ায়। তারপর যখন কাউকে আর বেরতে দেখা যায়নি কালো ছোট বাড়িগুলোর মধ্যে থেকে, তখন সাহসে বুক বেঁধে পা বাড়িয়েছিল নিচের দিকে। চারপাশের নিবিড় অন্ধকার তখন এমনই গাঢ় যে, পা ফেলতে হয়েছে আন্দাজে অন্ধের মতো। উজ্জ্বল ফ্যাকাশে সবুজ হয়ে উঠেছিল মাথার ওপরকার আকাশ। খিদে-তেষ্টার কোনও অনুভূতিই ছিল না। খাদের মাঝবরাবর পৌঁছে দেখেছিল একটা হিমেল জলস্রোত নেমে যাচ্ছে নিচের দিকে। বড় বড় গোলাকার পাথরে বিরল শৈবাল। মরিয়া হয়ে তা-ই মুখে পুরেছিল প্ল্যাটনার। মন্দ লাগেনি।

খাদের ঢাল বেয়ে নির্মিত সমাধিসৌধগুলির পাশ দিয়ে হাতড়ে হাতড়ে নিচে নামবার সময়ে মস্তিষ্ককে কিন্তু বিরাম দেয়নি। অব্যাখ্যাত এই রহস্যের সমাধানসূত্র অন্বেষণের চেষ্টা চালিয়ে গেছে বিরামবিহীনভাবে। অনেকক্ষণ পরে পৌঁছেছিল মস্ত জমকালো সমাধিস্তম্ভের মতো দেখতে সেই অট্টালিকার সামনে। এই সৌধের ভেতর থেকেই

পিলপিল করে গোল মুন্ডুদের ভেসে বেরিয়ে আসতে দেখেছিল একটু আগে। থমকে দাঁড়িয়েছিল প্রবেশ পথের সামনে। দেখেছিল, ভেতরে একটা আগ্নেয় শিলা জাতীয় প্রস্তরবেদির ওপর জ্বলছে বেশ কিছু সবুজ আলো। মাথার ওপরে অনেক উঁচুতে ঘণ্টা-গম্বুজ থেকে বেদির ওপর নেমে এসেছে একটা ঘণ্টার দড়ি, চারপাশের দেওয়ালে আগুন অক্ষরে লেখা রয়েছে অনেক দুর্বোধ্য বিষয়–অজানা হরফগুলো কিন্তু চিনতে পারেনি। হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে যখন আকাশ-পাতাল ভাবছে, তখন কানে ভেসে এসেছিল ভারী পায়ের আওয়াজ, প্রতিধ্বনি কাঁপতে কাঁপতে ভেসে আসছে রাস্তা থেকে। পায়ের মালিকরা যেন সরে যাচ্ছে দূর হতে দূরে-ধ্বনি মিলিয়ে যাচ্ছে দূরে। দৌড়ে বেরিয়ে এসেছিল প্ল্যাটনার। দাঁড়িয়েছিল অন্ধকারে, কিন্তু কিছুই দেখেনি। প্রবল ইচ্ছে হয়েছিল ঘণ্টার দড়ি ধরে নৈঃশব্দ্য ভেঙে দেয় এই মৃত্যুপুরীর।

তারপর বাসনাটা মন থেকে তাড়িয়ে দৌড়েছিল বিলীয়মান পায়ের আওয়াজের পেছনে। দৌড়েছিল আর গলার শির তুলে চেঁচিয়ে গিয়েছিল। অনেক দূরে গিয়েও কিন্তু দেখতে পায়নি পায়ের মালিকদের–হাঁকডাক শুনে কেউ কৌতূহল চরিতার্থ করতেও এসে দাঁড়ায়নি ওর সামনে। খাদের যেন শেষ নেই–অসীম অনন্ত। পৃথিবীর নক্ষত্রালোকে যে আঁধার, সেই আঁধারে ঢাকা পুরো খাদ। ওপরে পাহাড়চুড়োয় কেবল দিনের আভাস–রক্ত হিম-করা সবুজ দিবস। খাদের নিচে ভাসমান মুন্ডুদের আর দেখা যাচ্ছে না। পাহাড়ের ওপরে অন্তর্হিত হয়েছে প্রত্যেকেই। মাথা তুলে তাদের দেখতেও পেয়েছিল প্ল্যাটনার। কেউ ভাসছে স্থির হয়ে শূন্যে, কেউ বাতাস কেটে ধেয়ে যাচ্ছে কামানের গোলার মতো বিপুল বেগে, কেউ কেউ মৃদু গতিতে নড়েচড়ে বেড়াচ্ছে পাহাড়চূড়ার আনাচকানাচে, ঠিক যেন তুষারপাত ঘটেছে মস্ত আকাশে–তবে তুষারের মতো ধবধবে সাদা নয় কেউই। কেউ কালো, কেউ ম্যাড়মেড়ে সবুজ।

পদশব্দ অনুসরণ করেও কিন্তু কারও নাগাল ধরতে পারেনি সে। ভারী ভারী পা ফেলে ধুপ-ধুপ-ধুপ-ধুপ শব্দে খাদ কাঁপিয়ে যারা হেঁটে গেছে, তারা কিন্তু একটুও তাড়াহুড়ো করেনি–তাল কেটে যায়নি। একই ছন্দে গুরুভার পদশব্দ ধ্বনি আর প্রতিধ্বনির রেশ জাগিয়ে তুলেছে অসীমের পানে বিস্তৃত অন্ধকারময় খাদের মধ্যে–তা সত্ত্বেও দৌড়ে বেদম হয়ে গিয়েও কারও টিকি ধরতে পারেনি প্ল্যাটনার–দেখতেও পায়নি। শয়তান-খাদের নানা অঞ্চলে ছুটে গিয়েছে, পাহাড় বেয়ে উঠেছে, নেমেছে, শিখরে শিখরে ঘুরে বেড়িয়েছে পাগলের মতো, ভাসমান মুলুদের পর্যবেক্ষণ করেছে নানানভাবে। এইভাবেই কেটেছে সাত-আটটা দিন। সঠিক হিসেব মনে নেই–হিসেব রাখার চেষ্টাও করেনি। দু-একবার মনে হয়েছে, সন্ধানী চোখের নজর রয়েছে তার ওপর–কিন্তু জীবন্ত কোনও সত্তার সঙ্গে বাক্যালাপের সুযোগ ঘটেনি। ঘুমিয়েছে পাহাড়ের ঢালু গায়ে, খাদের মধ্যে পার্থিব সব কিছুই অদৃশ্যই থেকে গিয়েছে–কারণ পার্থিব বিচারে সেখানকার সমস্তই তো গভীর পাতালে। উঁচু অঞ্চলে পার্থিব দিবস শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দৃশ্যমান হয়েছে জগৎ। কখনও হোঁচট খেয়েছে গাঢ় সবুজ পাথরে, কখনও খাদের মধ্যে পড়তে পড়তে সামলে নিয়েছে কিনারা ধরে। সাসেক্সভিলের গলির পর গলি জেগে থেকেছে চোখের সামনে সর্বক্ষণ, যেন পাতলা ছায়ার মতো থিরথির করে দুলেছে, কেঁপেছে, ধরাছোঁয়ার বাইরে থেকেছে। কখনও মনে হয়েছে যেন হেঁটে চলেছে সাসেক্সভিলের রাস্তা বেয়ে, দুপাশের সারি সারি বাড়ির মধ্যে উঁকি মেরে দেখেছে গেরস্তদের ঘরকন্না–যা একান্তই গোপনীয়, তা-ও তার অজানা থাকেনি, তাকে কিন্তু কেউ দেখতে পায়নি, তার অস্তিত্বও টের পায়নি। তারপরেই আবিষ্কৃত হয়েছে চমকপ্রদ তথ্যটি। এই দুনিয়ার প্রতিটি মানুষের জন্য নির্দিষ্ট রয়েছে সেই দুনিয়ার এক-একটি মুন্ডু। ভাসমান মুন্ডু। প্রত্যঙ্গহীন অসহায় সত্তারা খর-নজরে রেখেছে এই দুনিয়ার প্রতিটি ব্যক্তির ওপর।

প্ল্যাটনার কিন্তু কোনওদিনই জানতে পারেনি এরা কারা–সজীব মানুষদের যারা চোখে চোখে রেখেছে সবুজ দুনিয়া থেকে–আজও তাদের পরিচয় অজ্ঞাত রহস্যই থেকে গেছে। তার কাছে। এদের দুজন অবশ্য দু-একদিনের মধ্যেই দেখেছিল তাকে, ছায়ার মতো লেগে থাকত পেছনে। প্ল্যাটনারের মা আর বাবা মারা গেছে শৈশবে। স্মৃতির মণিকোঠায় মুখের ছবি এখনও রয়ে গেছে। ছেলেবেলায় সেই স্মৃতিচিত্রের সঙ্গে আশ্চর্যভাবে মিলে যায় এই দুজনের মুন্ডুচিত্র। এ ছাড়াও মাঝে মাঝে অন্য মুখরাও বিশাল চোখের চাহনি নিবদ্ধ করেছে তার ওপর। একদা যারা ছিল তার আশপাশে, কেউ আঘাত দিয়েছে, কেউ সাহায্য করেছে, যৌবনে সঙ্গ দিয়েছে, আরও বড় হলে কাছে কাছে থেকেছে–কিন্তু এখন কেউ বেঁচে নেই–তাদের চোখের চাহনির সঙ্গে সবুজ দুনিয়ার এই এদের চাহনির মিল রীতিমতো বিস্ময়কর। চোখাচোখি হলেই অদ্ভুত দায়িত্ববোধে অভিভূত হয়েছে প্ল্যাটনার। মায়ের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করেছে কিন্তু উত্তর পায়নি। বিষণ্ণভাবে স্থিরচোখে কেবল চেয়ে থেকেছে ছেলের দিকে–স্নেহকোমল চাহনির মধ্যে মিশে ছিল যেন মৃদু তিরস্কার।

প্ল্যাটনার নিজে থেকে ব্যাখ্যা হাজির করার কোনও চেষ্টাই করেনি–যা দেখেছে, সেই গল্পই কেবল শুনিয়েছে। সজীব মানুষদের চোখে চোখে রেখেছে যারা, তারা কে, সত্যিই তারা মৃত সত্তা কি না, লোকান্তরে যাওয়ার পরেও ইহলোকের মানুষদের নিয়ে কেন তাদের এত মাথাব্যথা–এসবই আমাদের অনুমান করে নিতে হবে। আমার যা মনে হয়, তা এই: এ জীবনে ভালো করি কি মন্দ করি, তার রেশ থেকে যায় জীবন সমাপ্ত হয়ে যাবার পরেও। লোকান্তরের পরেও তা দেখে যেতে হয় আমাদের প্রত্যেককেই–পার পায় না কেউই। মৃত্যুর পর আত্মা যদি থাকে, মৃত্যুর পর মানবিক আগ্রহও টিকে থাকে।

বিনাশ নেই আত্মার, বিনাশ নেই আগ্রহেরও। প্ল্যাটনার কিন্তু জানায়নি ওর মনের কথা–যা বললাম, তা আমার নিজস্ব ধারণা। দিনের পর দিন সবুজ দুনিয়ার ক্ষীণ আলোকের মধ্যে ক্ষিপ্তের মতো সে ঘুরে বেড়িয়েছে, ক্লান্তিতে দেহ-মন ভেঙে পড়েছে, মাথায় চরকিপাক লেগেছে, শেষের দিকে খিদে-তেষ্টায় কাহিল হয়ে পড়েছে। দিনের বেলায়–মানে পার্থিব দিবসের আলোকে–পরিচিত সাসেক্সভিলের ভূতুড়ে ছায়ার মতো মানুষজন-দৃশ্য তাকে উদ্ভ্রান্ত করেছে। বুঝতে পারেনি কোথায় পা রাখা উচিত–প্রায়ান্ধকারে ঠাহর করতে পারেনি কিছুই। এরই মধ্যে কখনও সখনও সজাগচক্ষু আত্মার হিমশীতল পরশ বুলিয়ে গেছে মুখের ওপর। মানসিক অবস্থা অবর্ণনীয় হয়ে উঠেছে রাত নামলে। হেঁকে ধরেছে অসংখ্য পর্যবেক্ষক–পাহারাদারও বলা যায়। অগুনতি বিশাল চোখে মূর্ত নিঃসীম, বেদনা উন্মাদ করে ছেড়েছে তাকে। আতীব্র বাসনা হয়েছে ইহলোকে কিন্তু আসার–এত কাছে থেকেও কিন্তু অনেক দূরে থেকে গিয়েছে চেনাজানা এই জগৎ। অতৃপ্ত বাসনা ধিকিধিকি অনলের মতো পুড়িয়ে খাক করে দিয়েছে তাকে। মানসিক গ্লানি, অব্যক্ত বিষাদ তুঙ্গে পৌঁছেছে আশপাশের অপার্থিব ব্যাপারস্যাপার ইচ্ছে না থাকলেও দেখতে হয়েছে বলে। যন্ত্রণা কুরে কুরে খেয়েছে নীরব পাহারাদারদের ছিনেজোঁকের মতো পেছনে লেগে থাকা দেখে, চেঁচিয়েছে, যা মুখে এসেছে তা-ই বলেছে, পালাতে গিয়েছে, পালাতে গিয়ে বন্ধুর পথে মুখ থুবড়ে পড়েছে–তবুও সবুজ দুনিয়ার নাছোড়বান্দা পাহারাদাররা তার সঙ্গ ছাড়েনি, তার ওপর থেকে নজর সরিয়ে নেয়নি, তাকে রেহাই দেয়নি। অগুনতি মূক চাহনি নজরবন্দি রেখেছে দিনের পর দিন, রাতের পর রাত। প্ল্যাটনারের তখনকার আতীব্র যন্ত্রণা পাঠক-পাঠিকারা নিশ্চয় উপলব্ধি করতে পারবেন।

নবম দিবসে সন্ধ্যা নাগাদ আবার সেই অদৃশ্য পায়ের আওয়াজ শুনেছিল প্ল্যাটনার। তালে তালে পায়ের মালিকরা এবার এগিয়ে আসছে বহু দূর থেকে খাদের সীমাহীন পথের

ওপর দিয়ে–ধুপ-ধুপ-ধুপ-ধুপ আওয়াজ ধ্বনি আর প্রতিধ্বনির রক্ত-জমানো শব্দতরঙ্গ তুলছে দিকে দিকে। নদিন আগে ইহলোক থেকে মরলোকের যে পাহাড়ে অবতীর্ণ হয়েছিল প্ল্যাটনার, সেই মুহূর্তে ছিল সেই পাহাড়েই, প্রায় সেই জায়গাটিতেই। আওয়াজ শুনেই ধড়ফড় করে নেমে আসছিল পাহাড় বেয়ে খাদের দিকে। রহস্যময় পায়ের মালিকদের স্বচক্ষে দেখবার এ সুযোগ কি ছাড়া যায়? কিন্তু থমকে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল স্কুলের কাছেই একটা ঘরের মধ্যেকার দৃশ্য দেখে। দুজন মানুষ ছিল ঘরে। দুজনেই তার মুখ-চেনা, জানলা খোলা। খড়খড়ি তোলা। অস্তগামী সূর্যের আলো সটান ঢুকছে ঘরের মধ্যে খোলা জানলা দিয়ে। ঘরের সবকিছুই তাই প্রথমদিকে দেখা গিয়েছিল উজ্জ্বলভাবে। বেশ বড় লম্বাটে খোলামেলা ঘর। কালো নিসর্গদৃশ্য আর নীল-কৃষ্ণ সবুজাভ উষার পটভূমিকায় ম্যাজিক-লণ্ঠনের ছবির মতোই তা বিচিত্র। রোদ্দুরের আলো ছাড়াও সবে ঘরে জ্বালানো হয়েছে একটা মোমবাতি।

শয্যায় শুয়ে এক লিকলিকে কঙ্কালসার পুরুষ। লন্ডভন্ড বালিশে রাখা মাথা। বীভৎস সাদা মুখে অতি ভয়ংকর যন্ত্রণার অভিব্যক্তি। দুহাত মুঠি পাকিয়ে তুলে রেখেছে মাথার দুপাশে। খাটের পাশে একটা ছোট্ট টেবিল। টেবিলের কাছে ওষুধের খানকয়েক শিশি, কিছু সেঁকা রুটি আর জল, আর খালি গেলাস। মুহুর্মুহু দ্বিধাবিভক্ত হচ্ছে তার দুঠোঁট, কী যেন বলতে চাইছে–পারছে না। গলা দিয়ে আওয়াজ বেরচ্ছে না। সেদিকে দৃষ্টি নেই ঘরের দ্বিতীয় ব্যক্তির। পেছন ফিরে উলটোদিকে সেকেলে আলমারি খুলে কাগজপত্র হাঁটকাচ্ছে একটি স্ত্রীলোক। প্রথমদিকে রীতিমতো উজ্জ্বল স্পষ্ট থাকলেও পেছনের সবুজ উষা ক্রমশ স্পষ্টতর হয়ে ওঠার ফলে সামনের এই ছবিও তাল মিলিয়ে ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে এল একটু একটু করে।

প্রতিধ্বনির রেশ তুলে দূরের পদশব্দ তখন এগিয়ে আসছে তো আসছেই। অন্য জগতে সেই নিয়মিত ছন্দের ধুপ-ধুপ-ধুপ-ধুপ আওয়াজ মাদল-বাজনার মতোই গুরুগম্ভীর, বুকের রক্ত ছলকে ছলকে ওঠে। এই জগতে আওয়াজ পৌঁছাচ্ছে কিন্তু শব্দহীন কম্পনের আকারে। প্ল্যাটনারের বর্ণনাই হুবহু তুলে দিলাম। ভয়-ধরানো রক্ত হিম-করা সেই পদশব্দ যতই নিকটে এসেছে, ততই কোত্থেকে যেন অগুনতি অস্পষ্ট মুখ জড়ো হয়েছে মুমূর্ষর ধারেকাছে, জানালায় জানলায়। অন্ধকারের ভেতর চেয়ে থেকেছে ঘরের দুই ব্যক্তির দিকে –একজন শব্দহীন কণ্ঠে মরার আগে কিছু চাইছে–আর একজন সেদিকে না তাকিয়ে কাগজ হাঁটকে চলেছে। নির্বাক বিস্ময়ে চেয়ে থেকেছে প্ল্যাটনার। এই কদিন সবুজ দুনিয়ায় কাটিয়েও একসঙ্গে এত পাহারাদার পর্যবেক্ষককে এক জায়গায় জড়ো হতে সে একবারও দেখেনি। একদল নির্নিমেষে দেখছে মুমূর্ষুকে–আর-একদল নিঃসীম ও নিদারুণ মনস্তাপ নিয়ে চেয়ে থেকেছে স্ত্রীলোকটির দিকে। কাগজের পর কাগজ দেখছে সে–কিন্তু কিছুতেই খুঁজে পাচ্ছে না ঈপ্সিত বস্তু। চোখে ঝরে পড়ছে সীমাহীন লোভ, কদর্য লালসা। প্ল্যাটনারকে ঘিরে ধরেছিল এরা, চোখের সামনে ভিড় করে দাঁড়ানোয় ঘরের দৃশ্য আর সুস্পষ্ট দেখা যায়নি। শুধু শোনা গেছে অবিরাম আক্ষেপের হাহাকার। মাঝেমধ্যে অবশ্য পলকের জন্যে দেখা গেছে ঘরের দৃশ্য। প্ল্যাটনার দেখেছে, বিশাল চক্ষু মেলে অগুনতি মুখের একটা দল ভিড় করেছে স্ত্রীলোকটির চারপাশে। সবুজ প্রতিফলন কেঁপে কেঁপে ওঠা সত্ত্বেও সে দেখেছে, নিস্তব্ধ নিথর ঘরের মধ্যে মোমবাতির সটান ধোঁয়া উঠছে ওপরে। কানে ভেসে এসেছে বজ্রনির্ঘোষের মতো ধুপ-ধুপ-ধুপ-ধুপ পায়ের আওয়াজ। দিগদিগন্ত কাঁপিয়ে তারা আসছে... তারা আসছে! যাদের দেখা যায় না... তারা আসছে। ততই নিবিড় হয়ে উঠেছে ঘরের মধ্যে কাতারে কাতারে ভিড়-করা ভাসমান মুখগুলোর চাহনি। মেয়েটির একদম কাছ ঘেঁষে ভেসে থাকা বিশেষ দুটি মুখের বর্ণনা বড় নিখুঁতভাবে দিয়েছিল প্ল্যাটনার। দুজনের একজন নারী। মুখভাব কঠোর ছিল

নিশ্চয় এককালে। অপার্থিব জ্ঞানের পরশে এখন তা কোমল। অপরজন নিশ্চয় স্ত্রীলোকটির পিতৃদেব। দুজনেই পলকহীন চোখে স্ত্রীলোকটির জঘন্য নীচ কাণ্ডকারখানা দেখে যেন মরমে মরে রয়েছে–কিন্তু বাধা দেওয়ার ক্ষমতা আর নেই বলে কিছু করতেও পারছে না। এদের পেছনে ভাসছে সম্ভবত কিছু কুলোকের মুখ– একদা যারা কুশিক্ষা দিয়ে অধঃপাতে নামিয়েছে স্ত্রীলোকটিকে রয়েছে সৎ বন্ধুরা ব্যর্থ হয়েছে যাদের সৎ প্রভাব। ভাসমান মুখদের আর-একটা দল কাতারে কাতারে জড়ো হয়েছে শয্যাশায়ী মুমূর্ষ ব্যক্তির ওপর। দেখে মনে হয় না বাবা-মা বা বন্ধুবান্ধবস্থানীয়। প্রতিটি মুখ নারকীয়ভাবে আচ্ছন্ন ছিল নিশ্চয় কোনও এককালে, কিন্তু রুক্ষতা কোমল হয়ে এসেছে অপরিসীম দুঃখতাপে! সবার সামনে রয়েছে একটা বাচ্চা মেয়ের মুখ। রাগ নেই, অনুশোচনা নেই। অসীম ধৈর্য নিয়ে ক্লান্তিতে ভেঙে পড়ে যেন প্রতীক্ষা করছে সব কষ্ট অবসানের। একসঙ্গে এত মুখ এক জায়গায় কখনও দেখেনি বলেই সব মুখের বর্ণনা দিতে আর পারেনি প্ল্যাটনার। ঘণ্টাধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে তমিস্রা ফুড়ে আবির্ভূত হয়েছিল এদের প্রত্যেকে নিঃশব্দে... চোখের পলক ফেলতে যেটুকু সময় লাগে, তার মধ্যেই এত দৃশ্য দেখে নিয়েছিল প্ল্যাটনার। উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছিল নিশ্চয় লোমকূপের রন্ধ্রে রন্ধ্রে, অণু-পরমাণুতে, শিরায়, ধমনিতে। তাই অজান্তেই কখন জানি পকেটে হাত ঢুকিয়ে সবুজ গুঁড়োর শিশিটা টেনে এনে বাড়িয়ে ধরেছিল সামনে। একেবারেই অজান্তে–কখন যে পকেটে হাত ঢুকিয়ে শিশি টেনে বার করেছিল–প্ল্যাটনারের তা একেবারেই মনে নেই।

আচম্বিতে স্তব্ধ হয়েছিল পদশব্দ। কান খাড়া করেছিল প্ল্যাটনার আবার সেই রক্ত উত্তাল করা অপার্থিব আওয়াজ শোনার প্রত্যাশায়। কিন্তু নিথর নীরবতা ছাড়া কানের পরদায় আর কিছুই ধরা পড়েনি। তারপরেই, সহসা যেন শানিত ছুরিকাঘাতে ফর্দাফাঁই হয়ে গিয়েছিল থমথমে নৈঃশব্দ্য–কানের ওপর আছড়ে পড়েছিল তীক্ষ্ণ ঘণ্টাধনি।

প্রথম শব্দটার সঙ্গে সঙ্গে অসংখ্য মুখ দুলে উঠে ছুটে গিয়েছিল আশপাশ দিয়ে। আরও জোরালো হাহাকারের বুক-ভাঙা বিলাপে শিউরে উঠেছিল প্ল্যাটনার। স্ত্রীলোকটার কানে কিন্তু বুক চাপড়ানোর মতো এত জোর আওয়াজের বিন্দুবিসর্গ পৌঁছায়নি। তন্ময় হয়ে সে তখন মোমবাতির আলোয় পুড়িয়ে ছাই করছে একটা কাগজ। দ্বিতীয়বার ঘণ্টা বাজার সঙ্গে সঙ্গে আবছা হয়ে এসেছিল সবকিছুই, হিমশীতল একটা দমকা হাওয়া পাঁজর-ভাঙা দীর্ঘশ্বাসের মতোই বয়ে গিয়েছিল ভাসমান মুখগুলোকে ছত্রভঙ্গ করে দিয়ে। বসন্তের হাওয়ায় মরা পাতা যেভাবে উড়ে যায় ধরাছোঁয়ার বাইরে, সেইভাবেই অগুনতি মুখকে উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিল কনকনে বাতাসের ঝাপটা, তৃতীয়বার ঘণ্টার আওয়াজ শ্বাসরোধী নৈঃশব্দ্যকে খানখান করে ভেঙে চুরমার করে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কী যেন একটা এগিয়ে। গিয়েছিল শয্যা অবধি। অলোকরশ্মির কথা আপনারা অনেক শুনেছেন। কিন্তু সেদিন। প্ল্যাটনার যা দেখেছিল চোখ রগড়ে নিয়ে, তা অন্ধকারের রশ্মি, ছায়াময় একটা হাত আর তার বাহু!

দিগন্তব্যাপী ধু-ধু কালো শূন্যতাকে তখন গ্রাস করছে সবুজ সূর্য। ভোর হচ্ছে সবুজ দুনিয়ায়। আসছে ঘরের দৃশ্য। শয্যায় শায়িত হাড় বার-করা মানুষটা বিষম যন্ত্রণায় তেউড়ে ফেলেছিল সারা শরীর, বীভৎসভাবে বিকৃত হয়েছিল মুখ। চমকে ঘাড় ফিরিয়েছিল স্ত্রীলোকটা।

ঠান্ডা কনকনে হাওয়ার ঝাপটায় সন্ত্রস্ত মুখগুলো ভেসে উঠেছিল মাথার ওপর মেঘের মতো–সবুজ ধুলোর মতো উড়ে গিয়েছিল দমকা বাতাসে খাদের মধ্যেকার মন্দিরের

দিকে হু হু করে। ঘাড়ের ওপর দিয়ে বিস্তৃত ছায়াময় কালো বাহুর অর্থ আচম্বিতে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল প্ল্যাটিনারের অবশ চেতনায়।

অন্ধকারের হাত তখন খামচে ধরেছে মুমূর্ষ শিকারকে। ঘাড় ফিরিয়ে বাহুর অধিকারী কৃষ্ণ ছায়াকে দেখার সাহস হয়নি প্ল্যাটনারের। প্রবল চেষ্টায় শক্তি জুগিয়েছিল অসাড় পা দুখানায়। দুহাতে মুখ ঢেকে দৌড়াতে গিয়ে মুখ থুবড়ে পড়েছিল একটা গোল পাথরের ওপর–হাতের শিশি পাথরে লাগার সঙ্গে সঙ্গে চুরমার তো হয়েছিলই–প্রলয়ংকর বিস্ফোরণটা ঘটেছিল ঠিক তখনই।

পরের মুহূর্তেই দেখেছিল, রক্তাক্ত হাতে বিমূঢ় মস্তিষ্কে বসে রয়েছে লিডগেটের মুখোমুখি–স্কুলের পেছনে পাঁচিলে ঘেরা বাগানে।

প্ল্যাটনারের গল্পের শেষ এইখানেই। গল্প-লেখকের কায়দায় কিন্তু গল্পটা উপহার দিতে পারলাম না বলে দুঃখিত। সে চেষ্টাও করিনি। কল্পনার সাজ পরিয়ে এ ধরনের আজগুবি কাহিনিকে বিশ্বাসযোগ্য করার ধারকাছ দিয়েও যাইনি। প্ল্যাটনার যেভাবে বলেছে, লিখলামও সেইভাবে। মৃত্যুদৃশ্যকে গল্পের প্লটে ফেলে প্ল্যাটনারকে তার মধ্যে জড়িয়ে দিতে পারলে মন্দ হত না ঠিকই। কিন্তু প্রচলিত পদ্ধতি প্রয়োগের ফলে নির্জলা সত্য কাহিনিটা মিথ্যা হয়ে দাঁড়াত। সবুজ দুনিয়ার ছায়ামায়া এভাবে ফুটে উঠত না, ভাসমান মুখদের এভাবে হাজির করা যেত না, অন্ধকারের দুনিয়ার বিচিত্র প্রভাবকে এভাবে উপলব্ধি করা যেত না। খেয়াল রাখবেন, তাদের দেখা যাচ্ছে না ঠিকই–অষ্টপ্রহর কিন্তু বিশাল চোখ মেলে নজর রেখেছে আমাদের প্রত্যেকের ওপর।

শুধু একটা কথা বলা দরকার। স্কুল-বাগানের ঠিক পাশেই ভিনসেন্ট টেরেসে সত্যিই মারা গিয়েছিল এক ব্যক্তি–প্ল্যাটনারের পুনরাবির্ভাবের মুহূর্তে। মৃত ব্যক্তি পেশায় খাজনা আদায়কারী এবং বিমা এজেন্ট। বিধবা স্ত্রীর বয়স অনেক কম। গত মাসে বিয়ে করেছে অলবিডিং-এর পশুচিকিৎসক মি. হোয়াইম্পারকে। উপাখ্যানের এই অংশটা লোকমুখে জেনেছে এ তল্লাটের প্রত্যেকেই। এই কারণেই কাহিনিতে তার নাম উল্লেখ করার অনুমতিও দিয়েছে আমাকে। একটি শর্তে। মৃত স্বামীর অন্তিম মুহূর্তে প্ল্যাটনার যা যা দেখেছে, তার সবই যে ভুল, আমাকে তা লিখতে হবে। না, কোনও উইল সে পোড়ায়নি। একটাই উইল করেছিল লোকান্তরিত স্বামী বিয়ের ঠিক পরেই। প্ল্যাটনার কিন্তু উইল পোড়ানোর কোনও কথাই বলেনি অথচ ঘরের কোন ফার্নিচারটি কোথায় আছে, তা নিখুঁতভাবে বলে গেছে। বাস্তবে তা মিলেও গেছে। আরও একটা কথা। যদিও আগেও বলেছি কথাটা, আবার বলছি। বলতে বাধ্য হচ্ছি কুসংস্কারাচ্ছন্নদের ভয়ে। প্ল্যাটনার নদিন অন্তর্হিত হয়েছিল এই দুনিয়ার বাইরে–এ ঘটনার সাক্ষ্যপ্রমাণ আছে। তাতে কিন্তু তার কাহিনির সত্যতা প্রমাণিত হচ্ছে না। স্থান এর বাইরেও চোখের ভ্রান্তি অসম্ভব কিছু নয়। পাঠক-পাঠিকারা শুধু এইটুকুই মনে রাখবেন।



www.bengaliebook.com